UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

Discover natural fibres 2009

ফেব্রুয়ারি ২০০৯ February 2009

২১তম বর্ষ ২য় সংখ্যা Volume-XXI, No. II

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বিপন্ন ভাষাগুলো রক্ষায় এগিয়ে আসুন

একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তির দশ বছর পূর্তি হয়েছে। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) সাধারণ পরিষদের সভায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০০০ সাল থেকে ভাষার জন্য এ আন্তর্জাতিক দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে।

ভাষা কেবল ভাব প্রকাশের বা যোগাযোগের মাধ্যম নয়, ভাষা হলো সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ এবং তা শ্রেণী ও ব্যক্তির পরিচিতি নির্ধারণের একটি উপাদান। ভাষা মানবজাতির জীবন্ত উত্তরাধিকারের একটি অপরিহার্য অংশ, যা দৃশ্যমান বা অদৃশ্য সব ধরনের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও উন্নত করতে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

আজকে বিশ্বে মানুষ ৬ হাজার ৭ শ'র মতো ভাষায় কথা বলছে। যার মধ্যে প্রায় তিন হাজারের বেশি ভাষা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। কারণ গড়ে প্রতি দু'সপ্তাহে একটি করে ভাষা হারিয়ে যায়, ইতোমধ্যে প্রায় ৩০ হাজার ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, শতকরা ৯৬ ভাগ ভাষায় কথা বলে বিশ্বের শতকরা মাত্র ৪ ভাগ মানুষ, আফ্রিকার শতকরা ৮০ ভাগ ভাষার কোনো বানানরীতি নেই। অস্ট্রেলিয়ার একটি

আদিবাসী ভাষা হলো বুনুবা। এ ভাষায় কথা বলার মতো একশ'র বেশি লোক নেই, যাদের বেশিরভাগই প্রবীণ। বুনুবা ভাষাভাষী প্রবীণরা গল্প-কাহিনী শোনানোর মাধ্যমে পূর্ব পুরুষের ভাষাটি জানিয়ে যাচ্ছেন, যেমনটি হয়েছে অতীতে। বর্তমানে ব্যবহৃত ভাষাগুলোর এক-চতুর্থাংশেরও কম স্কুল ও সাইবার স্পেসে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বেশিরভাগই ব্যবহৃত হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে। দৈনন্দিনের প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হাজার হাজার ভাষায় সংশি-ষ্ট জনগোষ্ঠীগুলো পারদশী হলেও সেগুলোর উপস্থিতি সাধারণভাবে শিক্ষাব্যবস্থা, প্রচারমাধ্যম, প্রকাশনা ও জনক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয় না-একই কথা প্রযোজ্য আমাদের আদিবাসীদের ভাষার ক্ষেত্রে।

নানা কারণে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষাগুলো হারিয়ে যায়। অর্থনৈতিক দারিদ্র্য, সম্পদের অপ্রতুলতা, সামাজিকভাবে কোণঠাসা অবস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানসম্মত সামাজিক কার্যক্রমের অভাব, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষার চাপ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও ঔপনিবেশিকতা ভাষা হারিয়ে যাওয়ার কারণগুলোর অন্যতম।

বর্তমানে বিশ্বে সবল ১১টি ভাষা রয়েছে যার প্রতিটিতে ১০ কোটিরও বেশি লোক কথা বলে। এগুলো হলো: চীনা, ইংরেজি, স্পেনীয়, আরবি, হিন্দি, পর্তুগিজ, বাংলা, রুশ, জাপানি, ফরাসি ও জার্মান। এসব ভাষার সবই লিখিত এবং বিপুল সাহিত্য সম্পদে সমৃদ্ধ। আবার ৬ হাজারের বেশি ভাষায় এমন সব জনগোষ্ঠী কথা বলে যাদের প্রতিটির সংখ্যা ১০ লাখেরও কম। সামাজিক সমন্বয়ের উপাদান হিসেবে চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দুরীকরণে ভাষা কার্যকরভাবে একটি কৌশলগত ভূমিকা পালন করে। সাক্ষরতা, শিক্ষা ও জীবন দক্ষতার সমর্থক হিসেবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে ভাষা অপরিহার্য। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে হলে তাদের ভাষাতেই এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয় এবং পরিবেশের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার বিষয়টি স্থানীয় ও আদিবাসী ভাষার মিশ্রণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

জার্মান লেখক জোহানন ওলফুগ্যাঙ গোয়েথ বলেছিলেন, 'যে বিদেশি ভাষার সঙ্গে পরিচিত নয়, সে তার নিজের ভাষার কিছুই জানে না।' তাই প্রয়োজন প্রতিটি সমাজে ত্রিভাষা এগিয়ে নেয়া। এই কাজটি সফলতার সাথে করেছে লুক্সেমবার্গ। আপনি যদি তাদের বলেন যে ধনী বলে তারা তিনটি ভাষা শেখার বিলাসিতা ভোগ করতে পারছে, জবাবে তারা বলবেন, তিনটি ভাষা আছে বলেই আমরা ধনী।

এই তিনটি ভাষার প্রথমটি হতে হবে মাতৃভাষা, দ্বিতীয়টি প্রতিবেশীর ভাষা এবং তৃতীয়টি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। আমরা প্রায়শই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধাচরণ করি; তাই তাদের ভাষা আমাদের শিখতে হবে, তাদের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের আবিষ্কার করতে হবে এবং তাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ আমাদের জানতে হবে। ভাষা সুসম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে।

এক ভাষাবাদ বরাবরই একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। এর অর্থ হলো বিশ্বকে আপনি অনিবার্যভাবে একটিমাত্র ভাষার সীমিত মাত্রার মধ্য দিয়ে দেখেছেন, এমনকি তা একটি বিশ্ব ভাষা হলেও। এটা আধিপত্যেরও একটা কারণ। যেসব দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি রয়েছে, সেসব দেশেই মানুষ এক ভাষা নিয়ে থাকতে পারে। তবে এই অবস্থা নিশ্চিতভাবেই ভাষার নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি করে। বড় বড় বিশ্ব সম্মেলনগুলোতেও যেসব প্রতিনিধি সংখ্যালঘু ভাষায় কথা বলেন তারা তাদের বক্তব্যদান থেকে প্রায়শই বিরত থাকেন। কারণ তারা ভয় পান ও অস্বস্তি বোধ করেন। যাদের ভাষা আন্তর্জাতিক, সুবিধা ভোগ করেন তারা। এটা ন্যায়সঙ্গত নয়।

বিশ্ব বৈচিত্র্যকে জানতে হলে, বিশ্বের অফুরন্ত জ্ঞানভা□ারের খবর পেতে হলে, ছোট ভাষাগুলোকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কোনো সংখ্যালঘু মাতৃভাষা, হামলার শিকার হলে সে ভাষা ব্যবহারকারীরা অস্বস্তি বোধ করেন এবং একটি অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ রোপিত হয়। মানুষ যখন নিজেরা শান্তিতে থাকতে পারে না, তারা অন্যকেও শান্তিতে থাকতে দিতে চায় না। এখন পর্যন্ত ভাষাই একমাত্র হাতিয়ার যার মাধ্যমে আমরা পরস্পরকে বুঝি, সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ করি-সে যোগাযোগ লিখে হোক, কথা বলে হোক, কিংবা ইন্টারনেটে হোক ভাষা সংলাপের হাতিয়ার আর সংলাপ শান্তির সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রধান উপলক্ষ।

১৯৫২ সালের একুশ ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলাভাষার গুরুত্বকে অনুধাবন না করে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতিদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অথচ বিশ্বে একই দেশে একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকার নজির আছে। গিনি স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দেশের সর্বাধিক ব্যবহৃত আটটি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ৪১টি ভাষা গ্রহণ করতে হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে রাষ্ট্রীয় ভাষার সংখ্যা ১৯টি, ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুরে যথাক্রমে ২টি ও ৪টি সরকারি ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই বিশ্বায়নের যুগে শক্তিশালী ভাষাগুলোর তোড়ে ছোট ছোট ভাষা হারিয়ে যেতে বসেছে। ইংরেজির চাপে বাংলা যেন কোণঠাসা হয়ে না পড়ে তার প্রতি আমাদের যেমন নজর দিতে হবে, তেমনি বাংলার চাপে যেন এ দেশের ৪৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষাগুলো হারিয়ে না যায়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আশার কথা, ইউনেস্কো ও ইউএনডিপি তাদের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে আদিবাসীদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সমঝোতা, সহনশীলতা, সংলাপ, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বহুভাষা ও বহুসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় বিশ্ব গড়তে নির-লসভাবে সবাই কাজ করে যাব-আন্ত র্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এই হোক আমাদের সবার অঙ্গীকার।

ইউনেস্কো মহাপরিচালক কইচিরো মাতুসুরার বাণী

দীর্ঘ ১২ মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতিপর্বের পর এবার ২০০৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আগের কাজগুলোর প্রভাব ও মূল্যায়ন করার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

১০ বছর আগে বাংলাদেশ উত্থাপিত এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইউনেস্কো সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এ দিবসটি ঘোষণা করার পর আজ আমরা কী অর্জন করেছি?

একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে এ দিবসটি ভাষা বৈচিত্র্য ও বহুভাষাতত্ত্বের ভিত্তির প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। এটি সুস্পষ্ট যে, ভাষা ব্যক্তি ও মানুষের আত্মপরিচয়ের একটি অংশ এবং সবার জন্য শিক্ষা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর মূল হাতিয়ার।

ক্রমবর্ধমান হারে সরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজের অংশীদাররা স্বীকার করে যে ভাষা হলো সব ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকা□র কেন্দ্রবিন্দু। বহুভাষা শিক্ষার সাথে, সবার জন্য শিক্ষা এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর মধ্যে যোগসূত্রে স্থাপন এখন যে কোনো টেকসই উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

আমাদের আশা যে, মাতৃভাষার ব্যবহার এবং বহুভাষাতত্ত্ব থেকে প্রাপ্ত দৃশ্যমান ফলাফল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বর্ষ ২০০৮ উপলক্ষে ইউনেস্কো পরিচালিত যোগাযোগ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে এবং সরকারগুলোর ও উন্নয়ন সংস্থাগুলো কর্তৃক গৃহীত কর্মকা□গুলো অব্যাহত রাখতে এ চ্যালেঞ্জগুলো মূল ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করবে।

এছাড়াও ভাষা বর্ষ থেকে প্রাপ্ত সুফল এবং ২০০৮ সালে চালু হওয়া কয়েকশ' ভাষা উন্নয়ন প্রকল্প, ভাষা বর্ষের প্রভাব আগামী মাসগুলোতে উন্নয়ন, শান্তি ও সামাজিক সংহতিতে ভাষার গুরুত্ব পরিমাপের মানদ□ নির্ধারণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ১০ বছর পূর্তিতে আমি ২০০৮ সালে ঘোষিত এবং গৃহীত ঘোষণাগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই।

আমি বিশেষ করে আশা করি যে, সরকার তাদের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় এবং তাদের প্রশাসনে, দেশের ভাষাগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য ও ফলপ্রসূ সহাবস্থানের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এভাবেই আমরা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রকাশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে বহুভাষার পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে সফল হবো।

বহু ভাষার বিশ্বে শিক্ষা

বিশ্বের বহু দেশে বহুভাষা শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে। অনেক বহু ভাষার সমাজে এমন একটি জাতিতত্ত্ব গড়ে তোলা হয়েছে, যা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারে ভারসাম্য ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করে।

এ সমাজ এবং ভাষা সম্প্রদায়গুলোর প্রেক্ষিতে বলা চলে, বহু ভাষাতত্ত্ব সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। শিক্ষাব্যবস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ হলো এসব জটিল বাস্তবতাকে গ্রহণ করা এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা; যা শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও রাজনৈতিক দাবিগুলোকে বিবেচনা করবে। বহুভাষা সংস্কৃতি সমাজের জন্য একক শিক্ষাব্যবস্থা, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে সহজ, তবে তারা এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অর্জিত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের লোকসানের ঝুঁকিমুক্ত নয়।

সবুজায়ন

অর্থনৈতিক উদ্দীপনা আজকের বিশ্বের চালিকাশক্তি। এটা স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী, কেননা বিশ্বব্যাপী সরকারগুলো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরণে সংগ্রাম করছে। তবে যেহেতু নেতৃবৃন্দ অর্থনীতির আশু উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, সেহেতু তাদের এমন একটি নতুন অর্থনৈতিক মডেলের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্যও যৌথভাবে কাজ করতে হবে যা আমাদের এই বিশ্ব ব্রক্ষা ভবিষ্যতের জন্য টেকসই হবে।

আমাদের উদ্দীপক ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা একই সাথে দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করবে : প্রথমত, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নীতিমালার মাধ্যমে আমাদের অপরিহার্য এবং অতি জরুরি অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনগুলো চিহ্নিত করবে এবং দ্বিতীয়ত, একটি নতুন সবুজ বৈশ্বিক অর্থনীতির সূচনা করবে। এক কথায় আমাদের প্রয়োজন সবুজায়নের মুলমন্ত্র।

প্রথমত, সর্বব্যাপী বৈশ্বিক মন্দা থেকে উত্তরণের জন্য একটি সমন্বিত বৈশ্বিক উদ্যোগের প্রয়োজন। আমাদের প্রথম সারির সব অর্থনীতির মধ্যে উদ্দীপক সহায়তা ও নিবিড় সমন্বয় প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই 'প্রতিবেশী তুমি ভিক্ষুক ' নীতি এড়িয়ে চলতে হবে, যা ইতিহাসের মহামন্দার জন্ম দিতে সাহায্য করেছিল। আর্থিক দোদুল্যমানতা দুরীকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ সচল রাখা, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সাথে ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীর আত্মবিশ্বাস বাড়াতেও সমন্বয় সাধন গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াশিংটনে গত নভেম্বরে জি-২০ নেতৃবৃন্দ 'বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধার এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেছে। শিগগিরই এটা হওয়া প্রয়োজন।

উদ্দীপক সহায়তা অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরণ ঘটাবে, তবে এটা যদি সঠিকভাবে গঠন এবং কার্যকর হয় তাহলে তা একটি নতুন, স্বল্প কার্বন উদগিরক সবুজায়নের সূচনা করবে। ইতোমধ্যে বিশ্বের ৩৪টি দেশ প্রায় ২,২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্দীপক সহায়তা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে। অন্যান্য দেশের আরো অনেক নতুন উদ্যোগসহ এই সহায়তা একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করবে। তবে মৃতপ্রায় কারখানা ও আগের বদভ্যাসগুলো চলমান রাখবে না। কার্বন সমৃদ্ধ অবকাঠামো এবং জীবাশ্ম জ্বালানিতে অব্যাহতভাবে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলারের ভর্তুকি হবে আমাদের সামগ্রিক অর্জিত সম্পদ ধ্বংসকারী এক ধরনের বিনিয়োগ।

বৈশ্বিক জীবাশ্ম জ্বালানিতে বার্ষিক ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ভর্তুকি বন্ধ করলে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন ৬ শতাংশের মতো হ্রাস পাবে এবং তা বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সাথে যুক্ত হবে। শক্তির নবায়ন আমাদের সেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করবে যেখানে এগুলো বেশি প্রয়োজন। উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলো বিশ্বের বিদ্যমান ৪০ শতাংশ নবায়নকৃত সম্পদ এবং ৭০ শতাংশ পানি থেকে উৎপাদিত সৌর তাপশক্তির অধিকারী।

বিশ্বের সব নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আমেরিকা ও চীন বুঝতে পেরেছে সবুজায়ন কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং এটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অপরিহার্য অংশ। বিশ্বব্যাপী ২.৩ মিলিয়ন মানুষ নবায়ন শক্তি খাতে কাজ করছে, এখনই এই খাতে তেল ও গ্যাস শিল্পে সরাসরি কাজের চেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকাতে এখন কয়লা শিল্প অপেক্ষা বায়ু শিল্পে বেশি লোক চাকরি করছে। সবুজায়নের উদ্যোগকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে রাষ্ট্রপতি রাবাক ওবামা এবং চীনের উদ্দীপক প্যাকেজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সবুজায়নের জন্য এদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে কার্যকর করা দরকার।

আমরা সব সরকারকে সবুজায়নের উপাদান যেমন শক্তির দক্ষতা, নবায়ন, গণচলাচল, নতুন উন্নতমানের বৈদ্যুতিক গ্রিড ও পুনরায় বনায়নের জন্য বিনিয়োগ করতে এবং এসব কার্যক্রম থেকে দ্রুত ফলাফল পেতে তাদের সবার কাজের সমন্বয় সাধন করতে আহ্বান জানাই।

দ্বিতীয়ত, আমাদের এখন দারিদ্র্যবান্ধব নীতিনির্ধারণ করা প্রয়োজন। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের সরকারগুলোর অর্থ ঋণ করে বা টাকা ছাপিয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলা করার সুযোগ নেই। অতএব শিল্পোন্নত দেশগুলোকে তাদের দেশীয় সীমানা অতিক্রম করে সেসব মূল্য-উদ্দীপক খাতে বিনিয়োগ করতে হবে যা থেকে দরিদ্র দেশগুলো লাভবান হতে পারে। গত বছর কমপক্ষে ৩০টি দেশে খাদ্যের জন্য দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। আরও দুঃসংবাদের বিষয় হলো, গত সেপ্টেম্বরের অর্থনৈতিক সঙ্কটের আগেই এই বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়েছিল যা পরবর্তীকালে বিশ্বের আরো ১০০ মিলিয়ন মানুষকে গভীরতম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত করে। ভবিষতের দুর্ভোগ ও চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার উদ্ভব মোকাবিলায় আমাদের এখনই কাজ শুরু করতে হবে।

এর অর্থ হলো, এখনই বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য সামাজিক নিরাপত্তা জাল জোরদার করতে হবে। অর্থাৎ বীজ, যন্ত্রপাতি, টেকসই কৃষি কৌশলের চর্চা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান, যাতে তারা বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক বাজারে সরবরাহ করতে পারে সেজন্য উন্নয়নশীল দেশের কৃষিখাতে বিনিয়োগ করতে হবে।

দারিদ্র্যবান্ধব নীতির মানে হলো এমন খাতে বিনিয়োগ যা জমির উন্নত ব্যবহার, পানি সম্পদের সংরক্ষণ, খরা রোধক শস্য উৎপাদন করা, যাতে কৃষক জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। আর তা যদি করা না হয় তাহলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুধা ও অপুষ্টি আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

তৃতীয়ত, আমাদের ডিসেম্বরে কোপেনহেগেনে জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় দৃঢ় অঙ্গীকার করতে হবে। এটা এ বছরই কার্যকর করতে হবে, আগামী বছরের জন্য ফেলে রাখা যাবে না। আজ থেকেই জলবায়ু সংক্রান্ত সমঝোতাগুলো নাটকীয়ভাবে এগিয়ে নিতে হবে এবং উচ্চ পর্যায় থেকে মনোযোগী হতে হবে। কোপেনহেগেনে সমঝোতায় পৌছাতে সফল হলে জলবায়ুর পরিবর্তন মেকাবিলায় একটি মোটা অঙ্কের বৈশ্বিক অনুদান পাওয়া সম্ভব হবে।

একটি নতুন জলবায়ু কাঠামোর মাধ্যমে মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সরকার অবশেষে কার্বনের মূল্য নিয়ন্ত্রণে কীভাবে ব্যবসাগুলো শান্তিপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে তা অনুধাবন করতে পারবে এবং বিশুদ্ধ শক্তি উৎপাদনের একটি উপায় আবিষ্কার ও এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে। কোপেনহেগেন সুবজায়নের একটি সবুজ সঙ্কেত প্রদান করবে। এটি হবে একটি সত্যিকারের টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ভিত্তি যা আমাদের, আমাদের সন্তানদের এবং সন্তানদের সন্তানকে আগামী দশকগুলোতে সুফল দিতে থাকবে।

ডেট্রোয়েট থেকে দিলি- পর্যন্ত শত মিলিয়ন মানুষ এখন সবচেয়ে খারাপ সময় অতিবাহিত করছে। বহু পরিবার চাকরি, ঘরবাড়ি, স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ হারিয়েছে, এমনকি পরবর্তী প্রহরে তারা খাবারের সংস্থান করতে পারবে কিনা সে নিশ্চয়তাটুকুও তারা হারিয়েছে। এধরনের সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে সরকারকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৌশলী হতে হবে। অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির গুরুত্বকে অবশ্যই আমরা অবহেলা করতে পারি না। সবুজ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়। একটি ভারসাম্যপূর্ণ, উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য এটি একটি চৌকস বিনিয়োগ।

বান কি-মুন
মহাসচিব জাতিসংঘ
আল গোর
সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

শিক্ষা ও বহুভাষাতত্ত্ব

আইসল্যান্ডের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও ইউনেস্কো ভাষাবিষয়ক শুভেচ্ছা দূত ভিগডিস ফিনবোগাদোতির বলেছেন, 'যদি একটি ভাষা হারিয়ে যায় তবে সেই জাতিগোষ্ঠীর সবই হারিয়ে যায়, কারণ তখন একটি জাতি এবং সংস্কৃতি তাদের সব স্মৃতি হারিয়ে ফেলে, আর এভাবেই হারিয়ে যায় জটিল বিশ্ববরণ যা বিশ্বের মূল চালিকাশক্তি ও অস্বস্তি ত্ব প্রকাশের বাহন।'

ভাষা আমাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব প্রকাশের বহুমাত্রিক বাহন। কারণ ভাষার মাধ্যমে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে জ্ঞান স্থানান্তর করে থাকি। আমরা ভাষা ব্যবহার করি পরিবেশ, ইতিহাস এবং বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানভা□ার হিসেবে। বিশ্বের ৬০০০ থেকে ৭০০০ ভাষার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই এখন বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পতিত হওয়ায় ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থার (ইউনেস্কো) সাধারণ পরিষদের সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ২০০০ সাল থেকে ভাষার জন্য এ আন্তর্জাতিক দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে। এ দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বের সব জনগোষ্ঠীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মাতৃভাষা উন্নয়ন ও স্বীকৃতি প্রদান।

বহুভাষাতত্ত্ব প্রায় সব সদস্য দেশে প্রচলিত বৈশিষ্ট্য, বিশ্বের একক ঐশ্বর্যপূর্ণ জাতীয় পরিচয়, বিভিন্ন দেশের বহু সংস্কৃতির ঐক্যের ফসল যা স্থানীয় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষার মাধ্যম প্রকাশিত হয়।

ইন্টারনেটে বহুভাষাতত্ত্ব

তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আমাদের বিশ্বকে বদলে দিচ্ছে এবং উপাত্ত বিনিময় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। তবে ডিজিটাল বিভক্তি এখনো বিদ্যমান। এ ধরনের সুযোগপ্রাপ্তির বৈষম্য একটি ভাষাগত বৈষম্যও বটে। কেননা ওয়েবে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তা ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়। তাই সঙ্গত কারণেই ইউনেস্কো ইন্টারনেটে সংস্কৃতি ও ভাষা বৈচিত্র্য রক্ষায় এবং এগুলোর উন্নয়নে সদা ব্যাপৃত। এ বিষয়ে ইউনেস্কোর লক্ষ্য হলো :

'বিশ্বের সব ভাষার মধ্যে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ স্থাপন, ব্যবহারকারীদের ভাষাগত দক্ষতা বাড়ানো এবং ইন্টারনেটে বহুভাষা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি ও উন্নয়ন করা।'

এ সংস্থাটি বহুভাষাতত্ত্বের ব্যবহার এবং সাইবার স্পেসের সর্বজনীন ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি সংক্রান্ত একটি খসড়া সুপারিশমালা তৈরি করেছে। সংস্থা তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় সাইবার স্পেস ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে একগুচ্ছ কল্পনাপ্রবণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

একুশের বিশ্বায়ন

সম্প্রতি ইউনেস্কো বিশ্বের বিপন্ন ভাষাগুলোর অনলাইন এটলাস প্রকাশ করেছে

একুশের জাতিসংঘ স্বীকৃতি

ইউনেস্কোর পর জাতিসংঘও একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ৫ ডিসেম্বর ২০০৮ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এ স্বীকৃতি দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দফতর 'শান্তির জন্য সংস্কৃতি' শীর্ষক একটি প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৩তম অধিবেশনে তুলে ধরে। ভারত, কাতার, জাপান, সৌদি আরবসহ বিশ্বের ১২৪টি দেশ এ প্রস্তাব সমর্থন করে। এ প্রস্তাবে একুশ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এবং 'শান্তির জন্য সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির সাথে সংস্কৃতির সংলাপ'কে উৎসাহিত করতে মাতৃভাষাগুলোর অবদানকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি উলে-খ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ভাষা বর্ষ ২০০৮ উদযাপন

বর্তমানে বিশ্বে ৬ হাজার ৭০০ কথ্য ভাষা প্রচারিত রয়েছে। ভাষাভাষীর সংখ্যা বিচারে বিশ্বের বৃহত্তম ভাষা হলো মান্দারিন (চীনা), দ্বিতীয় ইংরেজি এবং সপ্তম হলো বাংলা ভাষা। প্রতি ১৪ দিনে বিশ্বের একটি করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে ভাষাকে রক্ষার জন্য ইউনেস্কো ২০০৮ সালকে 'আন্তর্জাতিক ভাষা বর্ষ' পালনের প্রস্তাব করে। ২০০৭ সালের ১৬ মে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এ সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সালে প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বর্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। ভাষা বর্ষের স্ে-াগান ছিল 'ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাটার'।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

ডিসেম্বর ২০০৮ সালে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সেগুনবাগিচায় ১ একর জায়গায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ চূড়ান্ত ভাবে শুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হলো-বিশ্বের ৬০৬০টি ভাষাকে টিকিয়ে রাখা, পা্ুলিপি সংরক্ষণ ও ভাষার উন্নয়ন। এ প্রতিষ্ঠানটি দেশি-বিদেশি

া নিয়ে নানাবিধ ুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে।

ভাষা বিষয়ক টুকরো খবর

হারিয়ে যাওয়া ভাষা

ইতোমধ্যে প্রায় ৩০ হাজার ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে

হুমকির মুখে ভাষা

- প্রায় তিন হাজারের বেশি ভাষা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে
- গড়ে প্রতি দু'সপ্তাহে একটি করে ভাষা হারিয়ে যায়।
- শতকরা ৯৬ ভাগ ভাষায় কথা বলে বিশ্বের শতকরা মাত্র ৪ ভাগ মানুষ।
- ৬ হাজারের বেশি ভাষায় এমন সব জনগোষ্ঠী কথা বলে যাদের প্রতিটির সংখ্যা ১০ লাখেরও কম।
- আফ্রিকার শতকরা ৮০ ভাগ ভাষার কোনো বানানরীতি নেই।
- অস্ট্রেলিয়ার একটি আদিবাসী ভাষা হলো বুনুবা। এ ভাষায় কথা বলার মতো একশ'র বেশি লোক নেই, যাদের বেশিরভাগই প্রবীণ।

বর্তমানে প্রচলিত ভাষা

- বর্তমান বিশ্বে মানুষ ৬ হাজার ৭ শ'র মতো ভাষায় কথা বলছে।
- ব্যবহৃত ভাষাগুলোর এক-চতুর্থাংশেরও কম স্কুল ও সাইবার স্পেসে ব্যবহৃত হয়।
- মোট সবল ভাষার সংখ্যা ১১, যার প্রতিটিতে ১০ কোটিরও বেশি লোক কথা বলে। এগুলো হলো : চীনা, ইংরেজি, স্পেনীয়, আরবি, হিন্দি, পর্তুগিজ, বাংলা, রুশ, জাপানি, ফরাসি ও জার্মান। এসব ভাষার সবই লিখিত এবং বিপুল সাহিত্য সম্পদের সমৃদ্ধ।

সর্বাধিক সরকারি ভাষার দেশ

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারতে বসবাসরত ১৯টি পৃথক সম্প্রদায়ের ভাষাকেই সরকারি ভাষায় স্বীকৃতি দিয়েছে সে দেশের সরকার। ভাষাগুলো হলো-আসামিজ, বাংলা, ইংরেজি, গুজরাতি, হিন্দি, কানাদা, কাশ্মিরি কোনকানি, মালোয়ান, মণিপুরি, মারাঠি, নেপালি, উড়িয়া, পাঞ্জাবি, সংস্কৃতি, সিন্ধি, তামিল, তেলেগু, উর্দু।

বহু সরকারি ভাষার দেশ

বিশ্বের বহুদেশের একই সাথে কয়েকটি সরকারি ভাষা প্রচলিত আছে-সিঙ্গাপুর (চীনা, ইংরেজি, মালয়, তামিল); শ্রীলঙ্কা (ইংরেজি, সিনহালা, তামিল)।

দ্বৈত সরকারি ভাষার দেশ

বিশ্বের বহুদেশে একই সাথে দুটি সরকারি ভাষা প্রচলিত আছে-আফগানিস্তান (পেশতু, দারি); ইন্দোনেশিয়া (বাহাসা, ইন্দোনেশিয়ান); নিউজিল্যান্ড (মাওরি, ইংরেজি); পাকিস্তান (উর্দু, ইংরেজি); ফিলিপাইন (তাগালগ, ইংরেজি); সামোয়া (সামোয়ান, ইংরেজি)।

এক-সরকারি ভাষা দেশ

বিশ্বের অনেক দেশে জনগণ বহুভাষায় কথা বললেও সেখানে একটিমাত্র সরকারি ভাষা প্রচলিত আছে-আর্মেনিয়া (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-আর্মেনিয়ান); অস্ট্রেলিয়া (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-ইংরেজি); আজারবাইজান (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-আজেরিয়ান); বাংলাদেশ (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-বাংলা); ভুটান (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-দযঙ্খা); কম্বোডিয়া (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৩টি, সরকারি ভাষা-খেমার); চীন (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-মান্দারিন); জর্জিয়া (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-জর্জিয়ান); ইরান (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-ফার্সি); কাজাকিস্তান (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-কাজাখ); দুই কোরিয়া (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ১টি, সরকারি ভাষা কোরিয়ান); কিরগিস্তান (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-কিরিজ); লাও (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-লাও); মালয়েশিয়া (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-মালয়); মঙ্গোলিয়া (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-মঙ্গোলিয়ান); মিয়ানমার (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-বার্মিজ); নাওরুন (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ২টি, সরকারি ভাষা-ইংরেজি); নেপাল (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা নেপালিজ); পাপুয়া নিউ গিনি (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৩টি, সরকারি ভাষা-ইংরেজি); তাজাকিস্তান (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-তাজিক); থাইল্যান্ড (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-থাই); তুর্কমেনিস্তান (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-তুর্কেম); উজবেকিস্তান (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-উজবেক); ভিয়েতনাম (সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ৫টি, সরকারি ভাষা-ভিয়েতনামিজ)।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org